বাংলাদেশের ৫০ বছর: প্রত্যাশা, প্রতিশ্রুতি এবং ভবিষ্যৎ

আলী রীয়াজ ও সাইমুম পারভেজ

৫০ বছর আগে বাংলাদেশ যখন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, তখন পৃথিবীর মনোযোগ আকর্ষণ না করলেও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে উন্নয়ন, গণতন্ত্র এবং ভূরাজনীতির আলোচনায় বাংলাদেশ কোনো না কোনোভাবে যে উল্লেখ্য, সেটা অনস্বীকার্য। স্বাধীনতা অর্জনের অল্প কিছুদিন পরই বাংলাদেশকে একটি আন্তর্জাতিক 'বাস্কেট কেস' এবং উন্নয়নের পরীক্ষাগার হিসেবেই চিত্রিত করা হয়েছিল। স্বাধীনতার পরের কয়েক দশক বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিত ছিল মূলত প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সামরিক অভ্যুত্থান, রাজনৈতিক সহিংসতা এবং দুর্নীতির মতো নেতিবাচক সংবাদের মাধ্যমে। এসব বিষয় যে এখন একেবারেই অপসৃত, তা নয়। কিন্তু এখন বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয় ভূরাজনীতির কারণেই।

বিশ্বরাজনীতির অন্যতম শক্তি চীন ও আঞ্চলিক শক্তি ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের ভৌগোলিক নৈকট্য এবং দক্ষিণ এশিয়াসহ এ অঞ্চলে এ দুই দেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাংলাদেশ বিষয়ে আলোচনায় এক নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। এ বিবেচনায় যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য বৈশ্বিক শক্তির কাছে বাংলাদেশ সাম্প্রতিক সময়ে গুরুত্ব পাচ্ছে। ক্ষমতার হাতবদল এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা সত্ত্বেও গত কয়েক দশকে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি সাধন করেছে, তা-ও আন্তর্জাতিক সমাজের মনোযোগ কাড়তে সক্ষম হয়েছে।

কিন্তু ৫০ বছরের মাথায় দাঁড়িয়ে বর্তমানের বাংলাদেশে গণতন্ত্রের পশ্চাৎযাত্রা, বিশেষ করে দুটি সাজানো জাতীয় নির্বাচনে ক্ষমতাসীনদের অভাবনীয় বিজয়, নাগরিকদের ভোটাধিকার হরণ, বাক্স্বাধীনতার অভাব এবং কর্তৃত্ববাদী সরকারব্যবস্থা এ গুরুত্ব ও অনেক অর্জনকেই ম্লান করে দিচ্ছে। সাধারণ জনগণের গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা প্রশ্নাতীত এবং এ আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখেই বৈষম্যহীন, মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু গত পাঁচ দশকে সেই আকাঙ্ক্ষা অধরাই রয়ে গেছে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান তৈরি ও শক্তিশালী করার বদলে দীর্ঘস্থায়ী সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃত্ববাদী সরকারের শাসন এবং দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের পরস্পরের প্রতি তীব্র শত্রুতামূলক আচরণ বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নে বাধা তৈরি করেছে। বাংলাদেশে উন্নয়নকে সঠিকভাবে বিকশিত হতে দেয়নি।

রাজনীতিতে নিজেদের বৈধতার সংকট মোকাবিলা ও ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করার লক্ষ্যে এবং ভোটের পাল্লা ভারী করতে ধর্মকে কেবল দুই দলই ব্যবহার করেছে তা নয়, অন্যরাও তা থেকে পিছিয়ে থাকেনি। এর সঙ্গে বৈশ্বিক প্রভাবে বাংলাদেশের সমাজেও এসেছে নানাবিধ পরিবর্তন। স্বাধীনতা দিবসের মাহেন্দ্রক্ষণে সাফল্যের উদ্‌যাপন স্বাভাবিক, কিন্তু রাষ্ট্র হিসেবে সামনে এগোনোর পথ অনুসন্ধানে তা-ই যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন বাংলাদেশ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, তা উপলব্ধি করা।

ভূরাজনীতিতে বাংলাদেশ কোথায়

একসময় বাংলাদেশ বিবেচিত হতো ভারতবেষ্টিত এবং ভারত ও মিয়ানমারের মধ্যে অবস্থিত এক ক্ষুদ্র আয়তনের দরিদ্র দেশ হিসেবে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশের এ পরিচয় যতটা প্রাধান্য পেয়েছিল, মধ্য সত্তরে পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন এবং ১৯৯০-এর দশকে বৈশ্বিক রাজনীতিতে বড় ধরনের অদলবদল এ পরিচয়ে পরিবর্তন আনে। যদিও বাংলাদেশ স্বতন্ত্রভাবে নিজের গুরুত্ব তৈরি

করতে পেরেছিল, এমন দাবি করা যাবে না। গত এক দশকে সেই অবস্থারও বদল ঘটেছে একাদিক্রমে চীনের উত্থান, বিশ্ব পরিসরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব হ্রাস, দক্ষিণ এশিয়ায় আধিপত্য বিস্তারের জন্য ভারতের সুস্পষ্ট প্রয়াস এবং তার প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং তার আলোকে বাংলাদেশের অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতির কারণে।

ওয়াশিংটন ও ঢাকার মধ্যে অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা সম্পর্কে বর্তমানে ঘাটতি না থাকলেও তা স্বাধীনতার পর পতন ও উত্থানের মধ্য দিয়ে গেছে। স্নায়ুযুদ্ধে নেওয়া নীতি অনুসারে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধিতার কারণে এবং স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে সোভিয়েত ব্লকের সঙ্গে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠতার জেরে দুই দেশের সম্পর্কে শীতলতা ছিল। জিয়াউর রহমান সরকারের সময় দুই দেশের সম্পর্কের যে উন্নতি ঘটে, পরের সামরিক ও বেসামরিক সরকারগুলোও এ সুসম্পর্ক বজায় রেখেছে।

৯/১১-এর হামলার পর মুসলিমপ্রধান দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে বিবেচনার কারণে বাংলাদেশ সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। নিরাপত্তার বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া এবং বুশ প্রশাসনের তথাকথিত 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের' বিবেচনা থেকে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয় নিরাপত্তা সহযোগিতার বিষয়। জর্জ ডব্লিউ বুশের আমল থেকেই যুক্তরাষ্ট্র মূলত ভারতের চোখেই বাংলাদেশকে দেখে এসেছে। এর পেছনে একটা বড় কারণ হচ্ছে, এ অঞ্চলে ভারতীয় আধিপত্য নিশ্চিত করে যুক্তরাষ্ট্র পরাশক্তি চীনকে ঠেকাতে চায়।

চীন কেবল বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অস্ত্র সরবরাহকারীই নয়, এখন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক অংশীদার। বৈশ্বিক পরাশক্তি হিসেবে চীনের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে চীনের বিনিয়োগ লক্ষ করা যায়। ২০১৬ সালে বাংলাদেশ ও চীন একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করে, যেখানে চীন ২৪ বিলিয়ন ডলার ঋণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। এটি বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ঋণ প্রতিশ্রুতি। যদিও চীনের দেওয়া ঋণের ডিসবার্সমেন্ট খুবই কম।

চীনের সঙ্গে এ চুক্তি স্বাক্ষরের কয়েক মাস আগেই বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে দুই বিলিয়ন ডলারের উন্নয়ন প্রকল্প ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর করে। কিন্তু ভারতের এ ঋণে যুক্তির চেয়েও বড় বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে তার সম্পর্ক রাজনৈতিক। বাংলাদেশের ন্যায্য পাওনা না মিটিয়ে, বাংলাদেশের সঙ্গে অসম বাণিজ্য বহাল রেখে ভারত যে সব ধরনের কৌশলগত ও অর্থনৈতিক সুবিধা লাভ করে, তার কারণ এটিই। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ভারতের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা সুস্পষ্ট। প্রায় এক দশক ধরে ভারত আওয়ামী লীগকে বাংলাদেশে কর্তৃত্ববাদী সরকারব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছে। ভারতের কূটনীতিক এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের কাছ থেকে আওয়ামী লীগ ২০১৪ ও ২০১৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে যে দ্বিধাহীন সমর্থন পেয়েছিল, তার মাধ্যমেই এ বিষয়ে ভারতের অবস্থান পরিষ্কার। ভারত আওয়ামী লীগকে প্রশ্নহীনভাবে সমর্থন দিয়ে যাওয়ায় বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর একটি অংশের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। কিন্তু এটা প্রশ্নাতীত যে ভারতের প্রত্যক্ষ প্রভাববলয়ের মধ্যে আছে বাংলাদেশ।

যদিও বাংলাদেশের বর্তমান সরকার রাজনৈতিকভাবে ভারতেরই কাছের বন্ধু, তবু চীনের জন্য তাদের দরজা কিন্তু বন্ধ নয়। এর কারণ কেবল অর্থনৈতিক সুবিধা নয়। চীনের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলার পেছনে বাংলাদেশের কর্তৃত্ববাদী সরকারের অন্য উদ্দেশ্যও রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিমা দেশগুলো, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও গণতান্ত্রিক পরিসর সংকোচন নিয়ে সমালোচনা রয়েছে। সম্প্রতি আল-জাজিরা টেলিভিশনে প্রচারিত একটি তথ্যচিত্রে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠার পর জাতিসংঘ দুর্নীতির তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে। মানবাধিকার বা গণতন্ত্রের সংকটের ইস্যুগুলোতে পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের যদি অবনতি ঘটে, সে ক্ষেত্রে বিকল্প হিসেবে চীনকে হাতে রাখতে চায় সরকার। অন্যদিকে, এ অঞ্চলে চীনের মিত্র পাকিস্তান, তাই বাংলাদেশের সঙ্গে মিত্রতার মাধ্যমে চীন ভারতের দুই দিকে মিত্রতার বলয় গড়তে পারবে ও ভারত মহাসাগরে তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে, এমন আশা থেকেই চীন বাংলাদেশের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠতা তৈরি করতে চায়।

বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত চীন ও ভারতের মধ্যে একটা 'ব্যালান্সিং গেম' বা ভারসাম্য নীতি বজায় রেখেছে। কিন্তু এ ভারসাম্য রাখাটা কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ ভারসাম্য রাখতে ব্যর্থতা যেকোনো একটি দেশের সঙ্গে শত্রুতা তৈরি করতে পারে। তাই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির সফলতা নির্ভর করবে কতটা দক্ষতার সঙ্গে বাংলাদেশ এ ভারসাম্যের 'দড়িতে' হাঁটতে পারে।

চীনের কাছাকাছি অবস্থান হওয়ার কারণে স্বাধীন ও যুগোপযোগী পররাষ্ট্রনীতি বাংলাদেশকে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারে। বঙ্গোপসাগরকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে বাংলাদেশ ইন্দো-প্যাসিফিক অর্থনৈতিক করিডরের একটি 'হাবে' বা কেন্দ্রে পরিণত হতে এবং দক্ষিণ এশিয়া থেকে শুরু করে মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও চীনের মধ্যে যোগাযোগে অবদান রাখতে পারে। কিন্তু তার জন্য বাংলাদেশকেই অগ্রণী হতে হবে, পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ রাজনীতির বিবেচনা বা ক্ষমতায় টিকে থাকার প্রশ্ন নয়, দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রে জো বাইডেন প্রশাসনের বাংলাদেশ বিষয়ে ভারতকেন্দ্রিক নীতির পরিবর্তন হবে কি না, সেটা এখনো স্পষ্ট নয়। কিন্তু এ অঞ্চলে চীনের প্রভাব কমাতে শুধু ভারতের ওপর নির্ভরতা বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের গ্রহণযোগ্যতার জন্য ইতিবাচক নয়। তার বদলে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র দুই দেশেরই উচিত নিজেদের স্বার্থ ও বোঝাপড়ার ভিত্তিতে অগ্রসর হওয়া।

প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি ও গণতন্ত্রের পশ্চাৎযাত্রা

একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ১৯৭১ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের জন্ম এবং গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সংরক্ষণের লক্ষ্য নিয়ে সংবিধান রচিত হলেও বাংলাদেশের ৫০ বছরে এসে বলা যাবে না যে সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়েছে। স্বাধীনতার কয়েক বছরের মধ্যেই এ আশাবাদ ফিকে হয়ে আসে। ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে যে একদলীয় সরকার গঠিত হয়, তাকে কর্তৃত্ববাদী ভিন্ন আর কোনোভাবেই ব্যাখ্যা করা যায় না। একই বছর আগস্ট ও নভেম্বর মাসে কয়েকটি সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়; হত্যা করা হয় বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবসহ দেশের প্রথম সারির নেতাদের। আর এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে সামরিক কর্তৃত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পরের ১৫ বছরে দেশ প্রত্যক্ষ করে সেনাশাসন, জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ড ও

এরশাদের উত্থান। আট বছর ধরে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন ১৯৯০-এর ডিসেম্বর মাসে এরশাদের সামরিক সরকারের পতন ঘটাতে সক্ষম হয়।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এ আন্দোলন বাংলাদেশে আবারও আশা জাগায়। সুষ্ঠু নির্বাচন, বাক্স্বাধীনতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা প্রভৃতি গণতন্ত্রের মৌলিক স্তম্ভগুলো পালনে সব রাজনৈতিক দল একমত হয়। ১৯৯১ সালে একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি ক্ষমতায় আসে। এর পরের কয়েকটি নির্বাচনে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ পালাক্রমে ক্ষমতায় আসে। এর মধ্যে ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন ছাড়া ২০০৮ সাল পর্যন্ত নির্বাচন ব্যবস্থা ছোটখাটো কিছু অনিয়ম ছাড়া সুষ্ঠুভাবেই সংঘটিত হয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করার চেয়ে প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের ক্ষমতা রক্ষা করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা শুরু করে ক্ষমতাসীন দলগুলো। বিএনপি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে তিক্ত শত্রুতা ও ক্ষমতার লড়াই জাতীয় সংসদ থেকে নামে রাজপথে, শুরু হয় সহিংস আন্দোলন। এ তিক্ততা এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয় যে ২০০৪ সালে তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেতা শেখ হাসিনাকে হত্যার চেষ্টাকে ক্ষমতাসীন বিএনপি লুকোছাপা করার চেষ্টা করে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কেউ কেউ ক্ষমতাসীনদের আনুকূল্য লাভ করেন। ১৯৯১ সাল থেকেই দুই দলের মধ্যে সহিংস বিরোধিতা সংসদকে অকার্যকর করে তোলে। গণতন্ত্র সুসংগঠিত করার বদলে ধীরে ধীরে প্রধানমন্ত্রীর হাতে সব ক্ষমতা তুলে দেওয়ার বন্দোবস্ত শুরু হয়। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো হয় দুর্বল আর 'নিয়মতান্ত্রিক'ভাবেই সব ক্ষমতার কেন্দ্র হয়ে ওঠেন প্রধানমন্ত্রী।

এত কিছুর পরও যে ১৯৯১ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত, ১৫ ফেব্রুয়ারি ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচন হচ্ছিল, তার কারণ তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা। ২০০৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন নিয়ে দুই প্রধান জোটের বিরোধিতা চরমে ওঠে। কেননা ইতিমধ্যে বিএনপি এ ব্যবস্থাকে নিজের অনুকূলে ব্যবহারের সাংবিধানিক ব্যবস্থা করেছিল; যার ফলে সহিংসতার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। রাজনৈতিক সহিংসতা ও আন্তর্জাতিক মহলের চাপ সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপের পথ তৈরি করে দেয়; তৈরি হয় সামরিক বাহিনী-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার। যদিও প্রথম দিকে এ সরকারের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন ছিল, জনসমর্থনও ছিল; কিন্তু অর্থনৈতিক সংকট, রাজনৈতিক সংস্কারের নামে বিরাজনৈতিকীকরণ এবং দীর্ঘ মেয়াদ এ সরকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান করে তোলে। পরবর্তী সময়ে ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে।

সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা আওয়ামী লীগকে সুযোগ করে দেয় এমন সব ব্যবস্থা নিতে, যাতে বিরোধী দলকে দুর্বল করে দেওয়া যায়, নির্বাচনকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনা যায়, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা খর্ব করা যায় এবং একটি ভয়ের সংস্কৃতি চালু করা যায়। রাজনীতিতে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আনতে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রমাণিত কার্যকর ব্যবস্থা 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা' বাতিল করে দেয়। আওয়ামী লীগ সরকার সমালোচকদের দমনে আইনগত ও আইনবহির্ভূত ব্যবস্থা নিতে থাকে। বিশেষ করে দুটি নিপীড়নমূলক আইন, ২০১৩ সালে সংশোধিত ২০০৬-এর তথ্য ও প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারা এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ ব্যবহার করে সরকারের সমালোচকদের গ্রেপ্তার করে ও নানা মেয়াদে দণ্ড প্রদান করে। এ আইনগত ব্যবস্থার

মাধ্যমে সরকার সমালোচনার মতো নাগরিক অধিকারকে ফৌজদারি অপরাধে পরিণত করেছে। এ ছাড়া মানবাধিকার সংগঠন 'অধিকার'–এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০০৯ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে কমপক্ষে ১ হাজার ৯২১ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন এবং ১০৯টি গুমের ঘটনা ঘটে।

বিচার বিভাগকে স্বাধীন করার ব্যাপারে আদালতের নির্দেশ এবং ২০০৭ সালে গৃহীত ব্যবস্থা সত্ত্বেও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিয়ে যে প্রশ্ন আছে, তা বোঝা যায় সম্প্রতি অবসর গ্রহণের আগে বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দারের কথা থেকে। তিনি বলেন, 'সাংবিধানিকভাবে বিচার বিভাগ স্বাধীন। কিন্তু বাস্তবে কতটুকু, তা আমরা সকলেই জানি এবং বুঝি।' নিম্ন আদালতে নিয়োগ, প্রশাসনিক কার্যক্রম ও অপসারণের ক্ষমতা কার্যত নির্বাহী বিভাগের হাতেই সোপর্দ করা আছে; ২০১৪ সালে জাতীয় সংসদ সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের ইমপিচ করার ক্ষমতা হাতে তুলে নেয়। এ সংশোধনী বাতিল করে দেওয়া রায়ের কারণে ২০১৭ সালে প্রধান বিচারপতিকে পদত্যাগ করতে হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে, তাঁকে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে বলেও তিনি দাবি করেছেন।

গত বছরগুলো, বিশেষ করে ২০১১ সালের পর থেকেই বিরোধী মত ও বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে আইন এবং আইনবহির্ভূত ব্যবস্থা নিতে আওয়ামী লীগ সরকার কুণ্ঠিত হয়নি। তাই ২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অবিশ্বাস্য ব্যবধানে জয় তেমন কাউকে অবাক করেনি। ২০১৪ সালে বিরোধী জোটের নির্বাচন বর্জনের ফলে বেশির ভাগ আসনে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াই আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা নির্বাচিত হন। ২০১৮ সালের নির্বাচনে প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা সফল হয় এবং দলটি ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টিতে জয়লাভ করে। এ নির্বাচনকে নিউইয়র্ক টাইমস 'প্রহসনমূলক' এবং দ্য ইকোনমিস্ট 'স্বচ্ছ জালিয়াতি' হিসেবে অভিহিত করেছে। এ দুটি নির্বাচনকে সাজানোর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল একটাই—সংসদে কোনো কার্যকর বিরোধী দল না রেখে আইন প্রণয়ন বিভাগকে নির্বাহী বিভাগের অধীন করা।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করতে নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি বর্তমান সরকার এমন একটি অবস্থা তৈরি করেছে, যেখানে রাষ্ট্র, সরকার এবং রাজনৈতিক দলের মধ্যে আর কোনো পার্থক্য নেই। তাই সরকারের বা সরকারি দলের সমালোচনা করা রাষ্ট্রবিরোধী কার্যক্রমের সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারের বা ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের সমালোচনা আর রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার মতো দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়কে একই কাতারে বিবেচনা করা হচ্ছে।

২০১৪ ও ২০১৮ সালে পরপর দুটি নির্বাচনে কারচুপি, বাক্‌স্বাধীনতা খর্ব করতে আইন প্রণয়ন, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বৃদ্ধি এবং বিচারব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার অভিযোগ—এসব ঘটনা খুব স্পষ্টভাবেই আমাদের দেখিয়ে দেয় বাংলাদেশ স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক চেতনা থেকে কতটা দূরে সরে গেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূচনায় সংসদীয় ব্যবস্থার অধীনে আইনসভার যে স্বাধীনতা থাকার কথা ছিল, জবাবদিহির যে ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার কথা ছিল, সেগুলো তো হয়ইনি, উল্টো

নির্বাহী বিভাগের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ক্ষমতার কেন্দ্র এখন সংসদ নয়, জনগণের সম্মতি শাসনের ভিত্তি নয়, শাসনের ভিত্তি হচ্ছে বলপ্রয়োগ।

নিয়ম রক্ষার নির্বাচন, নিয়ন্ত্রিত বিরোধী দল ও গণতন্ত্র রক্ষার বাকসর্বস্ব বুলি নিয়ে বাংলাদেশে এখন কেবল গণতন্ত্রের একটি খোলস পড়ে রয়েছে। অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাংলাদেশের যাত্রা, তা থেকে দেশ এখন অনেক দূরে।

রাজনীতিতে ধর্মের ফিরে আসা

১৯৭২ সালে রচিত বাংলাদেশের সংবিধানে সেক্যুলারিজমকে একটি রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। বাংলায় একে বলা হয় 'ধর্মনিরপেক্ষতা'। যেভাবে সেক্যুলারিজমকে তখন দেখা হয়েছিল, তাতে করে জনপরিসরে রাজনীতি ও ধর্মের বিভাজন থাকার কথা ছিল, রাষ্ট্রের এক ধরনের নিরপেক্ষ অবস্থানে থাকার প্রতিশ্রুতি ছিল। এই অবস্থানের কারণ ছিল এই যে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক আমলে ইসলাম ধর্মকে আইডিওলজি বা ভাবাদর্শের জায়গায় স্থাপন করে শাসনের হাতিয়ারে পরিণত করা হয়েছিল। কিন্তু ৫০ বছর পরে, আজ বাংলাদেশের রাজনীতির কেন্দ্রে ধর্ম ফিরে এসেছে। রাজনৈতিক নেতাদের বক্তৃতায় ধর্মের উদ্ধৃতির ছড়াছড়ি, ক্ষমতাসীন দল ইসলামপন্থীদের তোষণে ব্যস্ত, বিরোধী দল ইসলামপন্থীদের সঙ্গে তৈরি করা গাঁটছড়ার জালে আটকা পড়ে আছে এবং ধর্মভিত্তিক দলগুলো রাজনীতিতে শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করেছে। ধর্ম হয়ে উঠেছে ভাবাদর্শ।

ধর্মের রাজনীতিতে ফিরে আসার যাত্রা কার্যত শুরু হয়েছে '৭২–এর সংবিধান রচনার অল্প কিছুদিন পর থেকেই। সেক্যুলারিজমের তত্ত্বটি সঠিকভাবে ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে জনসাধারণ কেউ বুঝে উঠতে পারেননি, অথবা সমাজে এই বোঝাপড়া তৈরির কোনো প্রক্রিয়াও শুরু করা হয়নি। ধর্ম এবং রাজনীতির সম্পর্ক এবং রাষ্ট্র ও ধর্মের সম্পর্কের বিভিন্ন জটিল ও অনুপুঙ্খ বিষয় নিয়ে সমাজে আলোচনা হয়নি, বিতর্কের সুযোগ তৈরি করা হয়নি। একার্থে সমাজের এক এলিট অংশ যেভাবে বিবেচনা করেছেন তাকেই সবার মত বলে উপস্থাপন করা হয়েছে। তার পরে সামরিক সরকারগুলো তাদের বৈধতার সংকট মোচনে ধর্ম এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতির দ্বারস্থ হয়েছে; সংবিধান বদল এবং ধর্মভিত্তিক দলের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছে।

১৯৭৮ সালে সংবিধান থেকে সেক্যুলারিজম বাদ দেওয়া হয় এবং ১৯৮৮ সালে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা হয়। এরশাদবিরোধী আন্দোলনেও ইসলামপন্থী দলগুলো অংশগ্রহণ করে। ১৯৯১–পরবর্তী গণতান্ত্রিক পর্বেও ক্ষমতাসীন ও বিরোধী জোট তাদের ক্ষমতা রক্ষা ও দখলের লড়াইয়ে ইসলামপন্থীদের সঙ্গে মিত্রতা করে; আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে সহিংস শত্রুতা ইসলামপন্থীদের উত্থানে এবং শক্তি সঞ্চয়ে সহযোগিতা করেছে এটা অনস্বীকার্য। গত কয়েক দশকে যেমন সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলো রাজনৈতিক ডিসকোর্সে ধর্মকে নিয়ে এসেছে এবং ধর্মীয় ক্রীড়নকদের বৈধতা দিয়েছে, তেমনি ইসলামপন্থী সংগঠন ও আন্দোলনগুলো সমাজে ধর্মের প্রভাব বাড়িয়েছে। বাংলাদেশের নাগরিকদের জাতীয় আত্মপরিচয়ের সঙ্গে ধর্মের প্রসঙ্গকে এমনভাবে জড়িয়ে ফেলা হয় যেন নৃতাত্ত্বিক বাঙালি পরিচয়ের সঙ্গে ইসলাম ধর্ম অনুসরণের একটি বিরোধ রয়েছে। অথচ দীর্ঘ দিনের ইতিহাস বাঙালির বহুমাত্রিক পরিচয়ের প্রমাণ দেয়।

১৯৯৬–এর নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ সংসদের ভেতরে-বাইরে গাঁটছড়া বাঁধে জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে এবং বিএনপির বিরুদ্ধে একযোগে আন্দোলন করে। পরে ১৯৯৯ সালে বিএনপি জামায়াতের সঙ্গে জোট গঠন করে ২০০১–এর জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেয় ও জয়লাভ করে। জানুয়ারি ২০০৭-এ জাতীয় নির্বাচনের আগে নিজেদের জয় নিশ্চিত করতে প্রধান দুই দল ইসলামপন্থীদের কাছে টানা শুরু করে। নিজেদের সেক্যুলার হিসেবে দাবি করলেও আওয়ামী লীগ বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস নামের একটি কট্টর ইসলামপন্থী দলের সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি করে। বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোটের মধ্যে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোটের উপস্থিতি ভোটের রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারের উদাহরণ। ২০১৮–এর নির্বাচনের আগেও আওয়ামী লীগ ধর্মভিত্তিক দল তোষণ করেছে। বাংলাদেশে মোট ৬৬টি ইসলামপন্থী দলের মধ্যে ৬১টি জোটভুক্ত হয় আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোটের সঙ্গে, আর পাঁচটি বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোটের সঙ্গে।

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে ইসলামপন্থীদের রাজনৈতিক বৈধতা ও সামাজিক প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে ২০১৩–এর শাহবাগ আন্দোলনের পর। এর পটভূমি হচ্ছে ২০১০ সালে স্থাপিত যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এই ট্রাইব্যুনালের উদ্দেশ্য ছিল ১৯৭১ সালের মানবতাবিরোধী অপরাধে যুক্ত ব্যক্তিদের বিচার করে বিচারহীনতার সংস্কৃতির অবসান। কিন্তু উদ্দেশ্য বিষয়ে সমর্থন সত্ত্বেও পদ্ধতিগত ত্রুটি নিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে এর সমালোচনা হয়েছে। শাহবাগ আন্দোলন শুরু হয় সরকার ও অভিযুক্ত যুদ্ধাপরাধীদের মধ্যে কথিত যোগসাজশে কম সাজা দেওয়া হচ্ছে এই অভিযোগে। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার অতি দক্ষতার সঙ্গে আন্দোলনকে নিজেদের স্বার্থে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়। এই আন্দোলনের বিপরীতে হেফাজতে ইসলামের নেতৃত্বে কওমি মাদ্রাসাকেন্দ্রিক সংগঠন ও ছোট ছোট ইসলামপন্থী গোষ্ঠীগুলো একত্রিত হয়। শাহবাগ আন্দোলনকারীদের ইসলামবিরোধী নাস্তিক হিসেবে অভিহিত করে; এপ্রিল মাসে ঢাকা অভিমুখে লংমার্চ, মে মাসে মতিঝিলের শাপলা চত্বরের জমায়েত তাদের শক্তির এবং সমাজে তাদের আবেদনের প্রমাণ দেয়। তাদের উত্থাপিত ১৩ দফা দাবি, যাতে ব্লাসফেমি আইন ও ইসলাম অবমাননার সর্বোচ্চ শাস্তির বিধানের দাবি ছিল, সেগুলো সমাজে একধরনের বিভক্তির সূচনা করে। শাহবাগ ও শাপলা চত্বরের এই দুই আন্দোলন বাংলাদেশের সমাজে সবকিছুকে দুই ভাগে ভাগ করার ও তীব্র বিভাজন তৈরি করে দেয়। একদিকে কট্টর সেক্যুলারপন্থীরা, অন্যদিকে গোঁড়া ইসলামপন্থীরা বাংলাদেশের সমাজের সহজাত সহনশীলতা ও মধ্যম পন্থার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।

ধর্মীয় ও সেক্যুলার গোঁড়ামির মধ্যে চাপা পড়ে জনমানসের সহিষ্ণু গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা। যদিও প্রথম দিকে আওয়ামী লীগ সরকার শাপলা চত্বরে জড়ো হওয়া হেফাজতে ইসলামের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নেয়। কিন্তু পরে তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলে। বিশেষ করে ২০১৪ সালের বিতর্কিত নির্বাচনের পর থেকে আওয়ামী লীগ সরকার যতই কর্তৃত্ববাদী হয়ে উঠতে শুরু করে, ততই ইসলামপন্থীদের কাছে টানার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ২০১৪ সালেই সরকার পরিষ্কার করে দেয় যে শাহবাগকেন্দ্রিক সেক্যুলারদের চেয়ে মিত্র হিসেবে ইসলামপন্থীরা বেশি দরকারি। ২০১৪ সালের মার্চ মাসে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে মদিনা সনদ অনুযায়ী দেশ চলবে। হেফাজতে ইসলামকে খুশি রেখে নিজেদের রাজনৈতিক বৈধতা পেতে সরকার ২০১৭ সালে টেক্সটবুকে পরিবর্তন আনে, অমুসলিম লেখকদের

রচনা সরিয়ে ফেলে ও সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণ থেকে লেডি জাস্টিসের মূর্তি অপসারণ করে। ২০১৭ সালেই সরকার দেশব্যাপী ৫৬০টি মসজিদ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়।

২০১৩ সালের পর থেকে ইসলামপন্থী সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলোও মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। স্থানীয় সংগঠনগুলোর সঙ্গে সংযোগ তৈরি করে আল-কায়েদা এবং ইসলামিক স্টেটের মতো আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলো। শক্তি প্রয়োগ এবং আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী দলগুলো দুর্বল হয়ে পড়ার কারণে বাংলাদেশে জঙ্গি সংগঠনগুলো এখন দুর্বল বলেই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি ও প্রচলিত রাজনীতির প্রতি অনাস্থা সন্ত্রাসবাদের ভবিষ্যৎ উত্থানকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

গত ৫০ বছরে বাংলাদেশের প্রধান দল এবং সরকারগুলো যতই বৈধতার সংকটে নিপতিত হয়েছে, যতই গণতন্ত্রের পথ থেকে সরে গেছে, ততই ধর্ম এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ওপর নির্ভরশীল হয়েছে। সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ইসলামপন্থী দলগুলোর অংশগ্রহণ এবং অংশীদারত্বের সুযোগ অবশ্যই থাকার কথা এবং তার মধ্য দিয়ে তারা হয় বিকশিত হতো কিংবা জনগণের কাছে এক দুর্বল গোষ্ঠী বলে প্রমাণিত হতো। যেসব নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেগুলোতে ইসলামপন্থী দলগুলো ভালো ফল করেনি এবং তাদের প্রতি সমর্থন ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাচ্ছিল। কিন্তু ক্ষমতাসীন এবং ক্ষমতার বাইরের দলগুলো ইসলামপন্থীদের, বিশেষ করে রক্ষণশীল ইসলামপন্থীদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ার কারণে সমাজে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি তাদের শক্তির চেয়ে বেশি প্রভাবশালী হয়ে পড়েছে। রাজনীতির আলোচনার সূচি অংশত তারাই নির্ধারণ করছে। আশু এই অবস্থার অবসানের সম্ভাবনা নেই। উপরন্তু তা আরও বিস্তৃত হবে বলেই অনুমান করা যায়।

‘সফল’ অর্থনীতি ও পরিবর্তিত সমাজ

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর মাহেন্দ্রক্ষণে বাংলাদেশের সাফল্যের কথা বলতে গিয়ে যে কথা বারবার বলা হচ্ছে এবং হবে, তা হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতির সাফল্য—মোট জাতীয় উৎপাদন বা জিডিপির প্রবৃদ্ধি। কয়েক বছর ধরেই আমরা এই কথা শুনতে পাচ্ছি এই কারণেও যে ক্ষমতাসীনেরা এটা দেখাতে আগ্রহী, তাঁদের অব্যাহত শাসনামলে সুশাসনের ঘাটতি থাকলেও এবং গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে ব্যত্যয় ঘটলেও ‘উন্নয়ন’ হয়েছে। উন্নয়ন আর প্রবৃদ্ধি সমার্থক হয়ে গেছে। এটা অনস্বীকার্য যে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গত কয়েক দশকে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি লক্ষ করা গেছে।

এই বৃদ্ধির পেছনে অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। স্বাধীনতার আগে এবং স্বাধীনতা পাওয়ার পরের এক দশক বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষির ওপর নির্ভরশীল ছিল। বর্তমানে কৃষি নয়, বরং শিল্প ও সেবা খাতই দেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। দেশের বাইরে থেকে পাঠানো রেমিট্যান্স এবং তৈরি পোশাক রপ্তানি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রধানত অবদান রাখছে।

বাংলাদেশ এখন পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক। এ ছাড়া তৈরি পোশাকশিল্প খাতে এখন বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি মানুষ চাকরি করেন। মোট ৪০ লাখ কর্মীর মধ্যে ৩২ লাখই নারী। ১৯৭৯ সালে তৈরি পোশাকশিল্প থেকে আয় ছিল মাত্র ৪০ হাজার মার্কিন ডলার আর ২০১৯ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৪ দশমিক ১৩ বিলিয়ন ডলারে। তবে এই সাফল্যের পেছনে কত

শ্রমিকের ত্যাগ, স্বল্প বেতন আর অনিরাপদ পরিবেশে কাজ অবদান রেখেছে, তা ভুলে গেলে চলবে না। কয়েকটি প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা, বিশেষ করে রানা প্লাজা ধসে ১ হাজার ২০০ শ্রমিকের মৃত্যু এবং ২ হাজার ৫০০ মানুষ আহত হওয়ার পর পৃথিবীর নামীদামি পোশাক ব্র্যান্ডগুলো কাজের পরিবেশ তদারকির জন্য দুটি উদ্যোগ নেয়।

তৈরি পোশাক খাতের পাশাপাশি বিদেশে, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত শ্রমিকদের পাঠানো রেমিট্যান্স বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অবদান রেখেছে। ১৯৭৬ সালে এ খাত থেকে বাংলাদেশে আসত ২৩ দশমিক ৭১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০১৯-এ বেড়ে দাঁড়ায় ১৬ দশমিক ৩৭ বিলিয়ন ডলারে। বর্তমানে বাংলাদেশ রেমিট্যান্স গ্রহীতা দেশ হিসেবে পৃথিবীতে নবম স্থানে রয়েছে। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে এই দুই খাতের যে শ্রমিকগোষ্ঠী এই সাফল্যের নির্মাতা, তাঁদের ব্যাপারে রাষ্ট্র একধরনের নির্লিপ্ততাই অনুসরণ করেছে, তাঁদের নিরাপত্তা এবং অধিকার নিয়ে রাষ্ট্র কিছুই করেনি। একই কথা বলা চলে কৃষি খাত বিষয়েও। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা সত্ত্বেও ১৯৭৪ সালের পর বাংলাদেশ দুর্ভিক্ষে পতিত হয়নি; এই কৃতিত্ব একাদিক্রমে কৃষকের এবং নীতিনির্ধারকদের।

সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সূচনা থেকে বাংলাদেশের জিডিপি প্রতিবছর শতকরা ৫ থেকে ৬ ভাগ হারে বাড়ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এই বৃদ্ধি ছিল শতকরা ৭.৮ এবং ২০১৯-২০-এ ৭.৩। এই হার বিবেচনায় বাংলাদেশ পৃথিবীর পঞ্চম দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি। কিন্তু বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান জিডিপি বৃদ্ধির এই সরকারি পরিসংখ্যান সম্পর্কে সন্দিহান, কেননা খাতওয়ারি হিসাবের ফলের সঙ্গে সরকারের এই দাবি মেলে না।

গত কয়েক দশকে বাংলাদেশ মানবসম্পদ উন্নয়ন সূচকে, বিশেষ করে দারিদ্র্য দূরীকরণ, নিম্ন শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার, স্যানিটেশন ও নারীশিক্ষায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে। এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকার পেছনে কেবল যে রাষ্ট্রের ভূমিকা আছে তা নয়, বিভিন্ন সরকারের নীতিগত ধারাবাহিকতা, উন্নয়নবিষয়ক এনজিও, ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশের মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি কাজ করেছে। এদের সমন্বিত সাফল্যের প্রমাণ হচ্ছে এসব সূচকের অগ্রগতি। কিন্তু গত এক বছরে করোনাভাইরাস মহামারি এই সবকিছুকেই চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিয়েছে। দারিদ্র্য বেড়েছে, সমাজের এক বড় অংশের মানুষ জীবন এবং জীবিকা নিয়ে এখন আরও বেশি বিপদের মুখে পড়েছেন।

বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাফল্য অনেক অর্থনীতিবিদ ও উন্নয়নকর্মীকে অবাক করেছে। নিম্নমানের শাসনব্যবস্থা, জনসংখ্যার উচ্চ ঘনত্ব, প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অভাব, ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতিকে অনেকে 'বাংলাদেশ প্যারাডক্স' হিসেবে অভিহিত করেন। বিশেষ করে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ তাদের উন্নয়নের পোস্টার চাইল্ড হিসেবে বাংলাদেশের উদাহরণ নিয়ে আসে। কিন্তু এই আপাত-উন্নয়নের পেছনে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও ধনিকশ্রেণির অস্বাভাবিক উত্থান রয়েছে, তা বেশির ভাগ সময় আলোচনায় আসে না।

যখন অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির হার বেড়েছে, সেই একই সময়ে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় এবং তাদের হাতে সম্পদের হ্রাস ঘটেছে। দেশের ৪৬ শতাংশ শিশু বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের শিকার। জাতিসংঘের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশের প্রতি ছয়জনে একজন অপুষ্টির শিকার। অন্যদিকে ২০১৯-এ প্রকাশিত নিউইয়র্ককেন্দ্রিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ওয়েলথ এক্সএর একটি রিপোর্ট পৃথিবীর ১০টি দ্রুত বর্ধনশীল ধনীদের দেশের তালিকা প্রকাশ করে, যেখানে বাংলাদেশ ছিল তৃতীয়। এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে, যাতে রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে যুক্তদের পক্ষে রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুট করা এক স্বাভাবিক ঘটনায় রূপান্তরিত হয়েছে।

জিডিপির হিসাবে বাংলাদেশের অর্থনীতির যে প্রবৃদ্ধি, অর্থনীতির সেই সাফল্য সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে সমাজের এক ছোট অংশের হাতে। এই প্রবৃদ্ধি লাখো দরিদ্র মানুষের দরিদ্রতর হওয়াকে ঠেকাতে পারেনি। তার প্রভাব পড়েছে সমাজে, সামাজিক মূল্যবোধে, সামাজিক সংহতি বা কোহেশনে। ভোগবাদিতা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের পুরোনো বন্ধনগুলো ছিন্ন হওয়ার পথে, বিশেষ করে সমাজে সহনশীলতা ও সহমর্মিতার অভাব লক্ষণীয়।

বিশ্বায়নের কারণে এই ধারা আরও বেশি গতি পেয়েছে। প্রযুক্তির নতুন নতুন আবিষ্কার, বিশেষ করে ইন্টারনেটের ব্যবহার, বৈশ্বিকভাবে জনপ্রিয় সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস ও জীবনাচরণকে বাংলাদেশের মানুষের কাছে সহজে পৌঁছে দিয়েছে। সস্তা স্মার্টফোন আর ইন্টারনেট যোগাযোগের কারণে সমাজের একটা অংশ তথ্যপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারছে। ২০২০ সালের ডিসেম্বরে বিটিআরসি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে মোট ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা ছিল প্রায় ১১ কোটি। জানুয়ারি ২০২০-এ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, মোট মুঠোফোন সংযোগের সংখ্যা ছিল ১৬ কোটির বেশি এবং সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৬০ লাখ। এসব তথ্য সামনে রেখে সরকার দাবি করে যে তারা 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ে তুলেছে; কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের চেয়ে কম গতির ইন্টারনেট কেবল আফগানিস্তানে; ইথিওপিয়া ও সোমালিয়ার চেয়েও বাংলাদেশে ইন্টারনেটে গতি কম।

বৈশ্বিক ও স্থানীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের মিশ্রণ এককেন্দ্রিক নয়। পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে নতুন প্রযুক্তি ধর্মীয় সংস্কৃতিরও বিস্তার ঘটাচ্ছে, এমন প্রমাণও পাওয়া যায়। পরিবর্তনের অনিবার্যতা সত্ত্বেও এটাও ঠিক যে বাংলাদেশের সমাজের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একদিকে আছে দরিদ্র এবং ধনের বৈষম্য, আছে গ্রাম এবং নগরের পার্থক্য, তদুপরি তৈরি হচ্ছে ডিজিটাল ডিভাইড।

গত ৫০ বছরে নানা ধরনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে বাংলাদেশ। প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রতুলতা, অবকাঠামোর অভাব ও জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হওয়ার পরও বাংলাদেশের জনগণের টিকে থাকার সক্ষমতা দেশটিকে সাফল্য এনে দিয়েছে। যে দেশটি একসময় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ছিল প্রায় অচেনা, সেই দেশটি এখন জাতিসংঘের শান্তিরক্ষায় সবচেয়ে বেশি অবদান রাখছে। ক্ষুদ্রঋণের ওপর নির্ভর করে তৈরি হওয়া গ্রামীণ ব্যাংকের উন্নয়ন মডেল, যা বাংলাদেশের জন্য বয়ে এনেছে প্রথম নোবেল পুরস্কার, এখন দেশে-বিদেশে লাখো মানুষের জীবন পরিবর্তনে ভূমিকা রাখছে।

এ ছাড়া বাংলাদেশেই রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন ব্র্যাক। অর্থনীতি ও মানবসম্পদের অভূতপূর্ব উন্নয়নের এই ধারা গণতন্ত্রের অবনতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং

রাজনৈতিক অধিকার হরণের মাধ্যমে কলুষিত হচ্ছে। গণতন্ত্রকে সুসংগঠিত করা ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার বদলে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ গণতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তিগুলোকে লঙ্ঘিত করে অগ্রযাত্রার বদলে পেছনের দিকে হাঁটছে।

৫০ বছর পূর্তিতে প্রশ্ন উঠছে, বাংলাদেশের উন্নয়ন কি সামনের দিনে টেকসই হবে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী হয়ে নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করবে, নাকি বাংলাদেশ একটি পূর্ণ কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রে পরিণত হবে? কেবল প্রবৃদ্ধির হিসাব নয়, বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে এক ধরনের অংশগ্রহণমূলক অর্থনীতি তৈরি হবে কি না। বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক অবস্থানের সঠিক ব্যবহার দেশটিকে ভবিষ্যতে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারে, কিন্তু তা নির্ভর করবে গণতান্ত্রিক স্থিতিশীল রাজনীতি প্রতিষ্ঠা ও সঠিক পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণের ওপর; বাংলাদেশের আগামীর পথরেখা কি সেই দিকে?

****

আলী রীয়াজ: যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর, আটলান্টিক কাউন্সিলের অনাবাসিক সিনিয়র ফেলো এবং আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজের প্রেসিডেন্ট।

সাইমুম পারভেজ: নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক। তিনি সম্প্রতি ইউনিভার্সিটি অব সিডনি থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তিনি সন্ত্রাসবাদ, ডিজিটাল মিডিয়া ও বাংলাদেশ রাজনীতি নিয়ে গবেষণা করেন।